**পুষ্টিকর খাবার: শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে জরুরি**

সালমা আক্তার

 একটি দেশের সামগ্রিক মানবসম্পদের উন্নয়ন দেশের জাতীয় উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর এ জন্য জন্মলগ্ন থেকেই মানব সম্পদের যথাযথ পরিচর্যা প্রয়োজন। আজকের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষটি কি চিন্তা করবে, কিভাবে করবে, কতটুকু চিন্তাশক্তি কাজে লাগাতে পারবে, তা নির্ভর করে শিশুবেলায় তার গঠন ও মননে কী রকম গুণগত প্রভাব পড়ছে তার উপর। মূলতঃ মাতৃগর্ভ থেকেই শিশুর শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগিক বিকাশ শুরু হয়। বস্তুত একটি চমৎকার সুন্দর পরিবেশে জন্মগ্রহণ এবং একটি আনন্দময় পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ শিশুর জন্মগত অধিকার এবং এর প্রভাব অপরিসীম।

 আমেনা বেগম তিন বছর আগে মা হন। সন্তান প্রসবের জন্য কোনো ক্লিনিক বা হাসপাতালে যাননি তিনি। তার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় তার ডেলিভারির কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তার কথা মতো জন্মের পর শিশুটিকে বুকের দুধ খেতে না দিয়ে বেশ কয়েকবার মধু খাওয়াতে হয়েছে। সেই আত্মীয় আমেনার স্বামীকে জানায়, বুকের দুধে শিশুর পেট ভরছে না। ফলে আমেনা তার সন্তানকে বুকের দুধের পাশাপাশি টিনের দুধ খাওয়ালে কিছুদিনের মধ্যেই শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে অসুস্থ শিশুটিকে নিয়ে আমেনা হাসপাতালে যেতে বাধ্য হয়। আমেনা কখনও স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নেননি। এজন্য গর্ভকালীন ও সন্তান প্রসবের পর মা এবং সন্তানের পরিচর্যার বিষয়টি আমেনার কাছে আজানাই রয়ে গেছেন।

 শিশুর সুস্বাস্থ্য গঠনে পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব অনেক। শিশুকে উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে রাখতে হবে। তবেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সুষ্ঠু হবে। শিশুর স্বাস্থ্য বিকাশের অনুকূল পরিবেশ চাইলে মায়েদের কথাও ভাবতে হবে। মা যদি সুস্থ থাকে ও পুষ্টিসম্পন্ন খাবার গ্রহণ করে, তাহলে মায়ের গর্ভে থাকা শিশুটিও ভালো থাকবে। একজন সুস্থ মা-ই পারে একটি সুস্থ জাতি উপহার দিতে।

 ‘পুষ্টিহীনতা’ কিংবা ‘অপুষ্টি’ শব্দগুলোর সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অগণিত শিশু, বৃদ্ধ, যুবক অপুষ্টিতে ভুগছে। আমরাও এর ব্যতিক্রম নই। ‘পুষ্টি’ শব্দটি খুব শোনা গেলেও আমরা এর সঠিক সংজ্ঞা খুঁজি না। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শরীরে খাদ্য শোষিত হয়ে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। ফলে শরীরে বৃদ্ধি ঘটে। সর্বোপরি, পুষ্টি শোষিত হলেই দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়।

 পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে চাইলে অপুষ্টি বিষয়েও জানতে হবে। আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার গ্রহণ করে থাকি। খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে সব খাবারের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, যা গ্রহণে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিংবা কম খাবার গ্রহণ করলে দেহে যে তারতম্য ঘটে তাই অপুষ্টি । অপুষ্টি কেবল শারীরিক কিংবা পারিবারিক সমস্যা নয়, এটি সামাজিক, এমনকি অর্থনৈতিক সমস্যাও তৈরি করতে পারে। অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ কিংবা ঘন ঘন অসুখ হলে কম পুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। খাবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাবার গ্রহণ এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব পুষ্টির বাড়তি কিংবা অতিপুষ্টি সৃষ্টি করে, যাও অপষ্টি।

 একটি শিশুর জন্মের সময় সাধারণত ওজন ৩ থেকে ৩.৫ কেজি থাকে এবং উচ্চতা থাকে ৪৯ থেকে ৫০ সেন্টিমিটার। যদি ঠিকমতো শিশুকে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া যায় তাহলে ৫ মাস বয়সে ওজন দ্বিগুণ হয় এবং এক বছরে ওজন হয় তিনগুণ। এই হিসেবে ৫ মাস বয়সে একটি শিশুর ওজন হওয়া উচিত ৫ থেকে ৭ কেজি এবং এক বছরে ৯ থেকে ১০ কেজি। সেই সাথে উচ্চতা হবে ৫ মাসে ৬৫ থেকে ৬৭ সেন্টিমিটার এবং ১২ মাস বয়সে ৭৪ থেকে ৭৬ সেন্টিমিটার। শিশুর প্রথম ৬ মাস কেবল মায়ের দুধই তার জন্য একমাত্র পুষ্টিকর খাবার। ৭ মাস বয়স থেকে শিশুকে ফলের রস, সবজি, প্রোটিন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার, ডিমের কুসুম এবং ভাত, ডাল, সবজি ও তেল দিতে হবে। এই খাবারগুলো নরম করে শিশুকে তার উপযোগী করে খাওয়াতে হবে।

 জন্মলগ্ন থেকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটি আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সাথে সেগুলোকে ব্যবহার করার মাধ্যমে শিশু ধীরে ধীরে সহজ থেকে কঠিন যোগ্যতা অর্জন করতে থাকে, যা শারীরিক বিকাশ নামে পরিচিত। হলো শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক ও সামাজিক বিকাশের সমন্বিত রুপ।

 পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এমন শিশুদের দেখলেই বুঝা যায়। এসব শিশুদের পরিপূর্ণ শারীরিক বিকাশ হয় না। এরা বয়সের তুলনায় খাটো ও কম ওজনবিশিষ্ট হয়। এসব শিশুদের পর্যাপ্ত উচ্চতা থাকলেও কম ওজনবিশিষ্ট হয়ে থাকে তারা। আবার বয়সের তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত ওজন দেখা যায় অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের বেলায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অপুষ্টির শিকার হলে অনেকগুলো লক্ষণ শিশুদের মধ্যে প্রতীয়মান হয়। এসব শিশুরা দুর্বল ও চুপচাপ সাধারণত রোগা হয়। তাদের ঘাড় ও পাজরের হাঁড় স্পষ্ট চোখে পড়ে। তাদের কুচকানো চামড়া দেখা যায়। এসব শিশুরা হয় রগচটা ও খিটমিটে মেজাজের। হাত-পায়ে পানি আসা অতিরিক্ত অপুষ্টিতে দেখা যায়। ক্ষুধামান্দ্য রোগে ভুগে এসব শিশু।

-২-

 বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিশু পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এদের বেশির ভাগেরই প্রোটিন ও ক্যালরির ঘাটতি রয়েছে। এদের প্রায় ৩৫ শতাংশ খাটো, ৩৩ শতাংশ কম ওজনবিশিষ্ট এবং প্রায় ১৫ শতাংশ রোগা-পাতলা গড়নের। মাতৃগর্ভ থেকে কিংবা জন্মের পর সঠিক খাবার সুষম উপাদানে না পেলে শিশু অপুষ্টির শিকার হয়ে থাকে। অপুষ্টি এবং পুষ্টিহীনতার শিকার শিশুদের প্রভাব সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি-সব ক্ষেত্রেই পড়ে। নারীদের বেশির ভাগেরই জিংক, আয়রণ, আয়োডিনের স্বল্পতা দেখা যায়। এ সমস্যাগুলো সবক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। ২৬ শতাংশ নারীই রক্তস্বল্পতায় ভোগেন। পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের প্রায় ৩৩.১ শতাংশ রক্তস্বল্পতায় ভোগে। তবে আয়োডিনের অভাবে যেসব রোগ হতো সেগুলো বর্তমানে কমেছে অনেকাংশেই। শিশুদের মায়ের দুধ এবং সঠিক ও যথাযথ পরিমাণে পরিপূরক খাবার দেওয়া হলে, এই সামাজিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হবে। অপরিকল্পিত ও অপর্যাপ্ত খাবার গ্রহণ, খাবার নির্বাচনে অজ্ঞতা এবং একই ধরনের খাবার বার বার গ্রহণে এ সমস্যা বাড়ে। অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের প্রতি যত্মবান হতে হবে। কারণ এসব শিশুর মৃত্যুহার স্বাভাবিকের চেয়ে ৯ গুণ বেশি। সচেতনতা বাড়ালে তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যুঝুঁকিও কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

 আমাদের দেশে আঠারো বছর না পেরুতেই এখনো অধিকাংশ মেয়ের বিয়ে হয়। অথচ আঠারো বছরের নীচে কোনো মেয়ে সন্তান ধারণের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি থাকে না। ১৮ বছরের নীচে গর্ভধারণ নিরাপদ নয়। ১২ বছর বয়স থেকে মেয়েদের প্রজননঅঙ্গ সন্তানধারণ উপযোগী হতে শুরু করে এবং পূর্ণতা পায় ১৮ বছর বয়সে। এসময় অবশ্যই মেয়েদের পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দিতে হবে, যেন তার শারীরিক বিকাশ সঠিক হয়। তবেই সে সুস্থ শিশু জন্ম দিতে পারবে। নারী-পুরুষের বৈষম্যের কারণে কোনো মেয়ে শিশু যাতে অপুষ্টির শিকার না হয়, সে দিকে সবার নজর দিতে হবে। ১৮ বছর বয়সের নীচে গর্ভধারণের ফলেই আমাদের দেশে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার উন্নত দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। এ সমস্যা উত্তরণে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি প্রজননস্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

 জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকার পুষ্টিহীনতা দুর করার জন্য অনেক ধরনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছ এবং সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিওগুলি পুষ্টিহীনতা নিরসনে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির বৃদ্ধির হার, ঝড়ে পড়া হ্রাস এবং সারা বছর পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার দিতে নীতিমালার অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এ নীতিটি জাতীয় স্কুল মিল নীতি-২০১৯ নামে অবহিত। ১৯ আগস্ট ২০১৯ মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ নীতি উপস্থাপনের পর তা অনুমোদন পেয়েছে। আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে এই পদক্ষেপ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে। এই কর্মসূচির আওতায় সব শিক্ষার্থীকে সপ্তাহে পাঁচদিন রান্না করা খাবার এবং একদিন উচ্চ পুষ্টিমানসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হবে। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বখাদ্য সংস্থা যৌথভাবে ২০১১ সাল থেকে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম ১০৪ উপজেলায় বাস্তবায়ন করেছে। এ কার্মসূচির আওতায় ৩২ লাখ প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের মধ্যে দুপুরের বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় শক্তি চাহিদার ক্যালরির ন্যূনতম ৩০শতাংশ স্কুল মিল থেকে নিশ্চিত করা হবে,যা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৩ থেকে ১২ বছরের শিশুদের জন্য প্রযোজ্য হবে। দেশের সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে দুপুরের খাবার দেওয়া সরকারের বিরাট কর্মসূচি। কিন্তু এটিকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হলে সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। বিশেষ করে সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন মিডিয়ার ভূমিকা এখানে অনস্বীকার্য।

 শিশুদের অপুষ্টি প্রতিরোধে কিশোরী, গর্ভবতী মা এবং দুগ্ধদানকারী মায়ের যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অল্পবয়সে বিয়ে না দিলে সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে কমে আসবে। বাল্যবিয়ে দেওয়ার ফলে অল্পবয়সে মা হলে শিশু ও মা দুজনই অপুষ্টিতে ভোগে।

 পাশাপাশি অপুষ্টি প্রতিরোধে গর্ভবতীর খাদ্যাভাস ও ঔষধ গ্রহণে সচেতন হতে হবে। আয়রণ, জিংক গ্রহণ না করলে শারীরিক নানান সমস্যা তৈরি হয়। শুধু তাই নয়, এসময় পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রামেরও প্রয়োজন। পুষ্টি নিশ্চিতে পারিবারিক পরিবেশও হতে হবে সুখকর। শিশুর অপুষ্টি প্রতিরোধে প্রথমেই জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে শালদুধ পান করাতে হবে। জন্মের পর প্রথম ৬ মাস শুধুই মায়ের দুধ খেয়ে শিশু বড়ো হবে। ৬ মাস পূর্ণ হলে শিশুকে তার উপযোগী বাড়তি নরম খাবার দিতে হবে। তবে দুই বছর পর্যন্ত শিশুকে অবশ্যই মায়ের দুধ পান করাতে হবে এবং তাকে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধী টিকাগুলো সময়মতো দিতে হবে।

 আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। কাজেই একটু সচেতন হলেই শিশুর জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাবার নিশ্চিত করা সম্ভব । আর তা নিশ্চিত করতে পারলেই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রতিভার অধিকারী হবে। দেশ গঠনে সফল অবদান রাখতে পারবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সচেতনতায় দেশে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার এবং অপুষ্টির অভাব হ্রাস পাবেই পাবে। দেশ হবে অপুষ্টিমুক্ত। এমন স্বপ্ন দেখা অলীক নয়-বলা যায় দৃঢ়তার সাথেই।

#

২১.১০.২০১৯ পিআইডি ফিচার